যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com

অর্থনীতির রিপোর্টকার্ড: প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব

মৈত্রীশ ঘটক ও উদয়ন মুখার্জি লেখকের গ্রাহক হোন

আলোচনা | বিবিধ | ২৮ এপ্রিল ২০১৯ | ৪৮৬* বার পঠিত

পছন্দ জমিয়ে রাখুন পুনঃপ্রচার

মোদীনমিক্স -- এক মায়াবী মরীচিকা -- গুরুচণ্ডা৯ থেকে প্রকাশিত বইটিতে মোদী জমানার ফাঁকা আওয়াজগুলিকে চিরে চিরে দেখে তার অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করেছেন লেখকদ্বয়। এই লেখাটি তারই একটি অংশ। ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছেন সৌম্য শাহীন। মোদী জমানার সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পড়তে হলে অবশ্যই বইটি সংগ্রহ করুন।

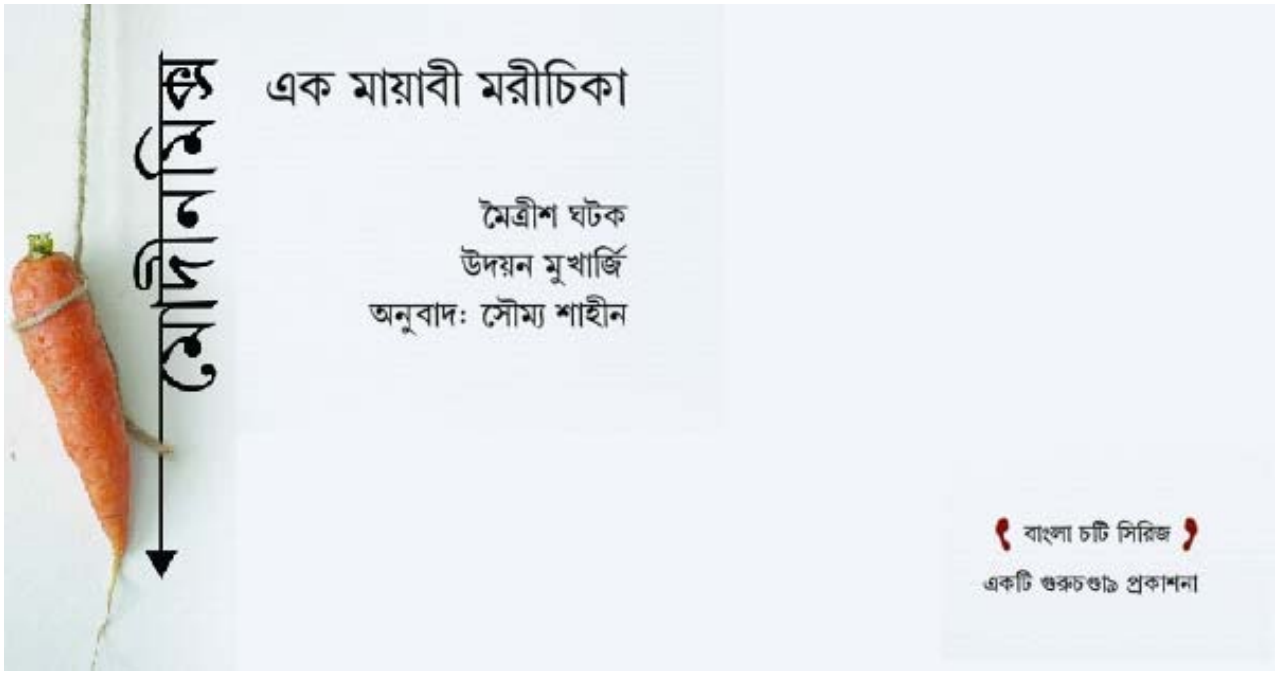

নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালের প্রায় পাঁচবছর অতিক্রান্ত। উন্নয়নের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি গুলো আজ এক নির্মম পরিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী ছাড়া আর প্রায় সর্বস্তরের মানুষেরই আশাভঙ্গ হয়েছে। এমনকি প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং আজকাল আর 'আচ্ছে দিনের' কথা মুখেও আনেন না। ওই শব্দবন্ধটি আজ বিজেপির রাজনৈতিক অভিধান থেকে বিলুপ্ত ঠিক যেমনভাবে কর্মসংস্থানের স্বপ্ন কোটি কোটি বেকার যুবক-যুবতীর চোখ থেকে হারিয়ে গেছে। যে মরূদ্যানের প্রতিশ্রুতি মোদী দিয়েছিলেন, আদতে তা ছিল এক মরীচিকা মাত্র। যাঁরা সেদিন জাদুকরের দেখানো স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, আজ স্বপ্নভঙ্গের বেদনা সেই সাধারণ, অরাজনৈতিক ভারতবাসীকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

মোদী জমানার অর্থনৈতিক ফলাফলকে বিশ্লেষণ করার সময় আমাদের বহিরঙ্গের চাকচিক্যের ভিতরকার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শাসনকালের প্রথমদিন থেকেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি-সর্বস্ব নীতিসমূহকে বিপণন করার দিকে জোর দিয়েছেন। এ'কাজে পাশে পেয়েছেন কর্পোরেট মিডিয়ার এক বিরাট অংশকে। এই রণনীতি আমাদের কিছুটা অবাকই করে কারণ তাঁর মত পোড় খাওয়া রাজনৈতিক নেতা এইধরনের অতি-আক্রমণাত্মক কৌশলের বিপদ সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত

থাকার কথা । তাই আজ পাঁচ বছর পর লোকসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে যেন নিজের ছায়ার সঙ্গেই যুদ্ধে নামতে হয়েছে। হয়ত নিজের বাগ্মিতার জালে আজ স্বয়ং জড়িয়ে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

আচ্ছে দিন?

২০১৪ সালে মোদীর নির্বাচনী ইস্তেহারে ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং ইউপিএ ২ জামানার শেষদিকে নীতিপঙ্গুতার ভারে ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির পালে নতুন হাওয়া বইয়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলো, আজ পাঁচ বছর পর সেই তথাকথিত সাফল্যের খতিয়ান নেওয়া যাক।

আমরা ক্রমাগতঃ শুনে আসছি যে এই জমানায় বার্ষিক আয়বৃদ্ধির হার ধারাবাহিক ভাবে ৭% এর উপরে থেকেছে। ২০১৮-এর সেপ্টেম্বরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রকাশিত 'হ্যান্ডবুক অফ স্ট্যাটিসটিক্স অন দ্য ইন্ডিয়ান ইকোনমি ফর ২০১৭-২০১৮'-এ দেখতে পাওয়া যায় যে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮'র আর্থিক বর্ষ - এই সময়কালে গড় আয়বৃদ্ধির হার ৬.৮% । গত বছর ডিসেম্বর মাসে নীতি (NITI) আয়োগ এই ধরণের তথ্যপ্রকাশের যে সাবেকি রীতি তা ভেঙে তড়িঘড়ি করে ওই একই সময়কালের জন্য একটি সংশোধিত জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যেখানে গড় আয়বৃদ্ধির হারে সামান্য বেশি দেখানো হয়েছে (৭.৩%)। এই পরিসংখ্যানের সূত্র ছিল সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস (সিএসও)। নির্বাচনের ঠিক কয়েক মাস আগে সিএসও আবারও একটি সংশোধিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যেখানে গড় আয়বৃদ্ধির হার এক লাফে পৌছে যায় ৭.৭%-এ। জিডিপি পরিমাপের পরিসংখ্যানগত বিতর্কে যদি নাও ঢুকি, সত্যিটা হল বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী বিগত ১৫ বছরে মাত্র ৫ বছর বাদ দিলে প্রতিবছরই ভারতের আয়বৃদ্ধির হার ৭% এর বেশি ছিলো। ভবিষ্যতই বলবে জিডিপির কোন তথ্য বিশ্বাসযোগ্যতার নিরিখে সর্বজনগ্রাহ্য হবে। কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী (যার গ্রহণযোগ্যতা আর্ন্তজাতিক মঞ্চে প্রশ্নাতীত), ভারতের আয়বৃদ্ধির হার ৭% এর নিচে চলে যায় ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার পরে, ইউপিএ-২ সরকারের শেষ তিন বছরে - যখন দেশ তথাকথিত 'অর্থনৈতিক নীতিপঙ্গুতা'য় ভুগছিল তখন, আর নোটবন্দির পরের বছরে।

যে রাজনীতিবিদ তাঁর অর্থনীতির জাদুকাঠির ছোঁয়ায় দেশকে নতুন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেন – আজ তাঁকে ৫৬ ইঞ্চি ছাতি চাপড়ে গড়ে ৭% আয় বৃদ্ধি নিয়েই বড়াই করতে হচ্ছে – এ বড় সুখের সময় নয়। বিশেষত যেখানে বিগত *এক দশক ধরেই* এই বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুসারে ভারতের গড় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৭৩% । এটা বোঝার জন্য পরিসংখ্যানবিদ হওয়ার প্রয়োজন হয় না যে আয় বৃদ্ধির হারকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর ক্রমাগত প্রচেষ্টা সত্তেও এই জমানায় কোনো দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন হয় নি।

চিত্র ১- ভারতের গড় আয়বৃদ্ধির হার এবং বিশ্বের গড় আয়বৃদ্ধির হার-এর বিয়োগফল

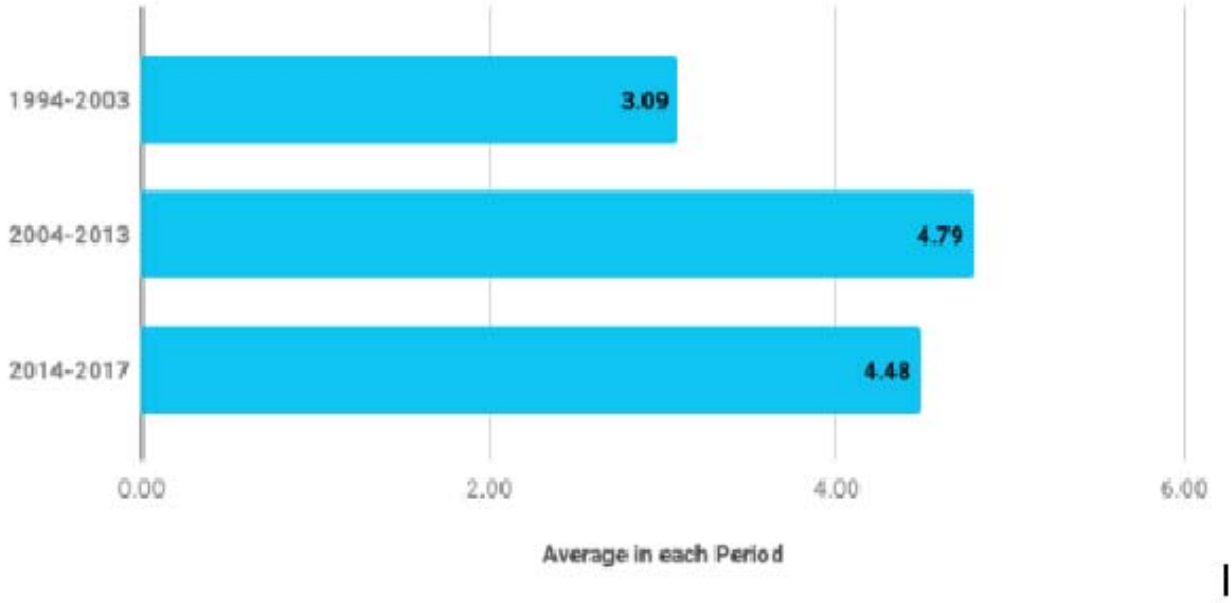

আমরা যদি ভিন্ন মাপকাঠি ব্যাবহার করি এবং বিশ্বের গড় আয়বৃদ্ধির হারের সঙ্গে ভারতের আয়বৃদ্ধির হারের তুলনা করি, তাহলেও বিগত ৪ বছর কোন স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে না (চিত্র ১, দ্রষ্টব্য), বরং মোদী জমানার আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার ইউপিএ-র জমানার থেকে কম বই বেশি নয় । এটা ঠিকই যে ভারতবর্ষ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির গুলোর মধ্যে অন্যতম, কিন্তু সেকথা বিগত দশকের ক্ষেত্রেও একইভাবে সত্যি। আজ সমস্ত এশীয় দেশের মধ্যে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ, কিন্তু তার কারণ চীন তার বিগত দু'দশকের শীর্ষ স্থান ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের আয়বৃদ্ধির হারের সঙ্গে বিশ্বের গড় আয়বৃদ্ধির হারের পার্থক্য বা বাকি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির গড় আয়বৃদ্ধির হারের পার্থক্য মোদী জমানায় বাড়ার বদলে ক্রমাগত কমেই চলেছে, বিশেষত আগের দশকের তুলনায়। অথচ বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনাম, এই দুই এশীয় দেশ বিশ্বের গড়ের তুলনায় তাদের আপেক্ষিক আয়বৃদ্ধির হার একই সময়কালে বাড়িয়ে নিয়ে সক্ষম হয়েছে।

আয়বৃদ্ধির হার নিয়ে এই অনর্থক বিতর্ক আসলে উন্নয়নের মূল বিষয়গুলো থেকে আলোচনার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেয়। আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে মোদীর শাসনকালে গভীর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, এই সত্যকে জিডিপি বা অন্য কোনো বিমূর্ত সূচক দিয়েই লুকানো সম্ভব না। তাই অর্থনীতির হিসাব নিকাশ করতে বসলে সাধারণ মানুষ কেমন আছেন এটা জানা সংখ্যাতত্ত্বের কূট তর্কের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন যেকোনো অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ - আর সেটাই ছিল ২০১৪ সালে মোদীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মূল সুর। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাঁর সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

জীবন ও জীবিকার সমস্যাগুলো সমাজের গরিষ্ঠ অংশের মানুষের কাছে মুখ্য বিষয়। আর এখানেই মোদীর বৃহত্তম ব্যর্থতা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুরক্ষা, মর্যাদা, স্বাধীনতা এইসব হল উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ এক-একটা মাত্রা, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের তাৎপর্য এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় যে আর্থিক ক্ষমতা থাকলে বাকি সবকটা ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের পথ অনেকটাই সুগম হয়।

জীবিকার প্রশ্নে মোদীর প্রতিশ্রুতি ছিল আকাশচুম্বী: দশ বছরে পঁচিশ কোটি বা বছরে আড়াই কোটি কর্মসংস্থান। প্রতিবছর শ্রমের বাজারে প্রায় দেড় কোটি কর্মপ্রার্থী যোগদান করে। আমরা যদি সিএমআইই-র পরিবারভিত্তিক সমীক্ষার ফলাফল দেখি, তাহলে দেখব ২০১৮ সালে কোন নতুন কর্মসংস্থানই হয়নি। উল্টে ২০১৭ সালে যেখানে ৪০ কোটি ৬৭ লক্ষ মানুষ কর্মরত ছিলেন, ২০১৮ সালে সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ৪০ কোটি ৬২ লক্ষে। ২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পাওয়া সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ কোটি তে। ২০১৭ সালে ১৮ লক্ষ নতুন চাকরি তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটা মোট কর্মপ্রার্থীর মাত্র ১২% এবং মোদীর প্রতিশ্রুত আড়াই কোটির মাত্র ৭%। ২০১৬ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ১৪ লক্ষ।

সিএমআইই-র তথ্য ভাণ্ডার থেকে এও দেখা যায় যে ২০১৪-১৮ সময়কালের মধ্যে গড়ে কর্মসংস্থান বেড়েছে ১.৯% হারে যা তার আগের দশকের তুলনায় কম। এবার সরকারি তথ্যসূত্রের দিকে তাকানো যাক। লেবার ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে ২০১৫-১৬ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৩.৭%। একটি সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টে দেখা গেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লেবার ব্যুরোর একটা বিস্ফোরক রিপোর্টকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রেখেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৬-১৭ সালে শেষবার যখন কর্মসংস্থান সম্পর্কে সমীক্ষা করা হয়, বেকারত্বের হার তখন ছিল ৩.৯%। ২০১২-১৩ সালের ৪% এর পর বেকারত্বের হার এত বেশি আর কখনও হয় নি।

চিত্র ২: যুববেকারত্বের হার

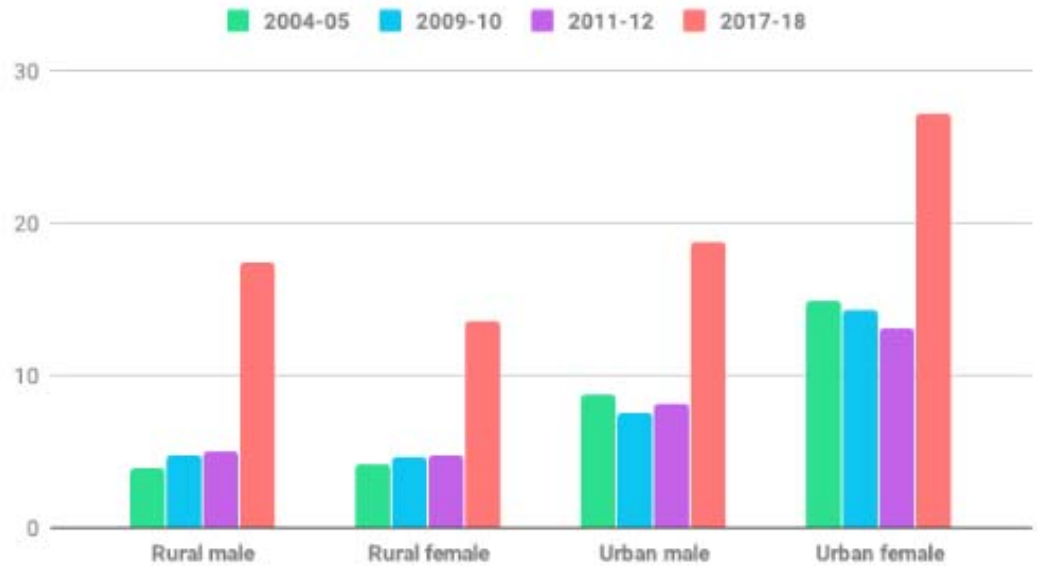

সর্বশেষ ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (এনএসএসও)-র সমীক্ষার যে রিপোর্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, তা আরও আশঙ্কাজনক। ২০১৭-১৮ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৬.১% (সারণী ১)যা বিগত চার দশকের মধ্যে সর্বাধিক। ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশন ছাড়পত্র দেবার পরেও সরকার এই রিপোর্টটিকে দিনের আলো দেখতে দেয়নি। এর ফলে দুজন সদস্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। আরও দুশ্চিন্তার যেটা তা হলো শহর ও গ্রামের প্রতি পাঁচজনের একজন যুবক কর্মহীন (চিত্র ২)। এই তথ্যসমূহ তর্কাতীতভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মোদী সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করে।

সারণী ১: বেকারত্বের হার (শতাংশে)

১৯৭৭-৭৮	২.৫
১৯৮৩-৮৪	১.৯
১৯৮৭-৮৮	২.৬
১৯৯৩-৯৪	১.৯
১৯৯৯-২০০০	২.২
২০০৪-০৫	২.৩
২০০৯-১০	২.০
২০১১-১২	২.২
২০১৭-১৮	৬.১

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার কথা বলা যাক। ভারতীয় রেলের ৬৩০০০ চাকরির জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ আবেদন পত্র জমা পড়ে। অথবা মহারাষ্ট্র সরকারের ১৩টি বেয়ারার পদের জন্য জমা পড়া ৭০০০ আবেদনপত্র থেকে ১২ জন গ্র্যাজুয়েটকে শেষ পর্যন্ত কাজে নেওয়া হয়। এই ঘটনাগুলো উপরের তথ্যসমূহকে বাস্তবের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বিশেষ করে শহরে এবং মফস্বলে যেখানে প্রতি বছর দেড় কোটি যুবক যুবতী শ্রমের বাজারে প্রবেশ করে সেখানে উপরোক্ত ঘটনাগুলো একটা ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করতে বাধ্য।

কর্মহীনতা নিয়ে এই দেশ জোড়া অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ায় সরকার অন্তত নির্বাচন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই তথ্য গুলিকে চেপে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে সত্যিটা সকলের সামনে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। এইভাবে তথ্য ধামাচাপা দেবার ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জগতে ভারতীয় পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রভূত ধাক্কা খেয়েছে আর এর ফলাফল হতে চলেছে সুদূরপ্রসারী। এর ফলে ভারতের লগ্নির ওপরও প্রতিকূল প্রভাব পড়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের প্রভাব গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরও গভীরভাবে পড়েছে। ভারতীয় কৃষকের প্রতি মোদীর স্পষ্ট আশ্বাস ছিল যে উৎপাদন মূল্যের ওপর ৫০% লাভ তাঁরা পাবেন এবং ২০২২ সালের মধ্যে তাঁদের আয় দ্বিগুণ হবে। শুধু এইসব প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি তাই নয়, কৃষি ক্ষেত্র এক বিপুল বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে।

চিত্র ৩: কৃষি ক্ষেত্রের গড় বৃদ্ধি, ১৯৯৪-২০১৭

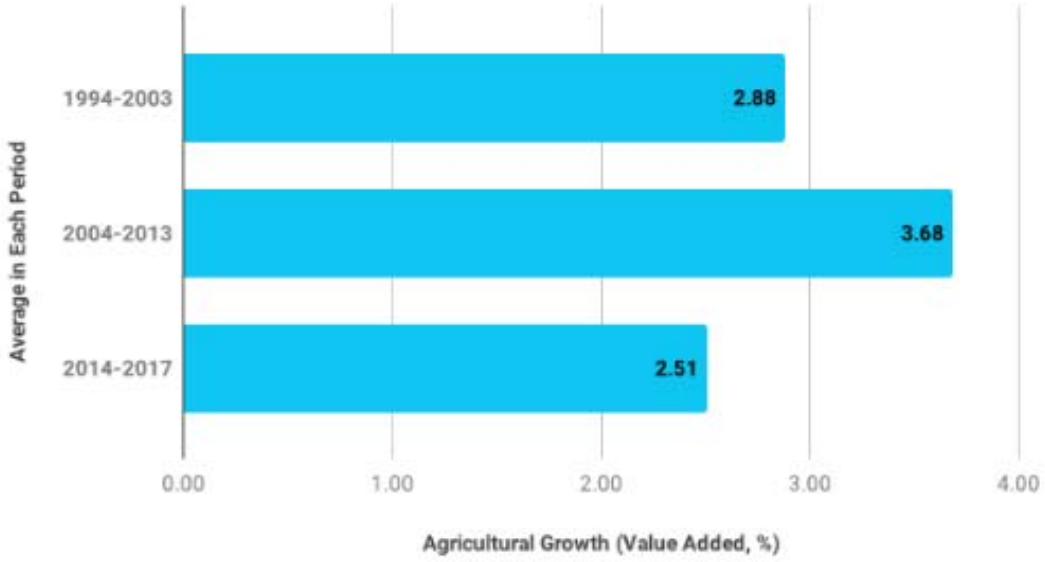

উপরের চিত্র থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে মোদীর আমলে কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিলমাত্র ২.৫১%। যেখানে তার আগে ২০০৪ থেকে ২০১৩ সালে গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭% আর তার আগের দশকে ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ সালে গড় বৃদ্ধির হার ছিল ২.৮৮ % ।(চিত্র ৩)

সাধারণ পাটিগণিত করলে দেখা যাবে যে আট বছরে কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ করতে হলে ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৯% রাখতে হবে। কৃষি বিপ্লব ছাড়া এই ধরনের অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিকভাবে মোদীর প্রতিশ্রুতিকে আজগুবি ছাড়া কিছুই বলা চলে না। পাঁচ বছরের শেষে দেখা যাচ্ছে, এমনকি আগের দুই দশকের তুলনাতেও কৃষি ক্ষেত্রের হাল আগের দু'দশকের চেয়ে খারাপ।

গ্রামীণ মজুরির বৃদ্ধির হার দশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন, আর ২০১৮-য় মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যবৃদ্ধির হারের চেয়েও কম ছিল। অর্থাৎ প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার ছিলঋণাত্মক। এই সময়ে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য অন্যান্য সামগ্রীর চেয়ে কম বৃদ্ধি পেয়েছে। নোটবন্দির পর শস্যের দাম নিম্নমুখী হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা শহরের তুলনায় সঙ্কুচিত হয়েছে। ২০১৮ সালে জ্বালানির দাম ঊর্ধ্বগামী হওয়ায় সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি এক সর্বগ্রাসী দারিদ্রের জালে জড়িয়ে পড়েছে। মনে রাখা ভালো এই ক্ষেত্রটিতে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন, কিন্তু জাতীয় আয়ে তাঁদের ভাগ এক পঞ্চমাংশেরও কম।

এ কথা সত্য যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে কাজ করতে আসেন। অথচ নোটবন্দির পরে কৃষিজীবি মানুষের পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অর্থোপার্জনের সুযোগ নির্মমভাবে সঙ্কুচিত হয়। ১৬ই নভেম্বর ২০১৬র আগে ভূমিহীন কৃষক অনেক সময়েই ঘর ছেড়ে নিকটবর্তী শহরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে দিনমজুরের কাজ করতেন। নোটবন্দির পরে এইসব ক্ষেত্রে, যেমন নির্মাণশিল্প, আবাসন, উৎপাদন শিল্প প্রভৃতিতে শ্রমের চাহিদা উবে গেল। তার কারণ এইসব ক্ষেত্রগুলো সাধারণত নগদের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা।যায় নির্মাণ শিল্পের কথা, যেখানে নোটবন্দির পর বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়।অথচ সরকার এই সময়ে একশো দিনের কাজের প্রকল্পকে ধারাবাহিকভাবে অবহেলা করার ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিজেদের শোচনীয় ব্যর্থতা ঢাকতে সরকার অনেক সময়ই শিল্প ক্ষেত্রের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। এটা আংশিকভাবে সত্যি, আর এখান থেকেই মোদী সরকারের আরেকটা ব্যর্থতার কাহিনি শুরু হয় - সেটা হলো নিম্ন বৃদ্ধির হার এবং তার ফলে নতুন বিনিয়োগ আর কর্মসংস্থানে অনাগ্রহ।

চিত্র ৪:

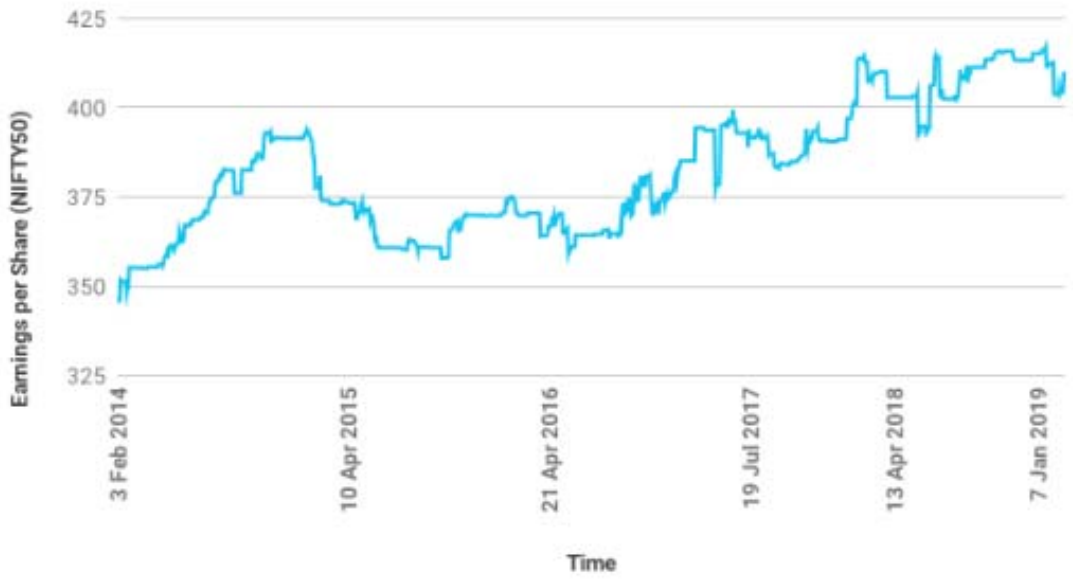

যদিও সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই সময়ে জিডিপি বৃদ্ধির হার যথেষ্টই স্বাস্থ্যকর, কর্পোরেট মুনাফা কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়েনি। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিফটি সুচকের প্রতি শেয়ারে আয় ছিল ৩৫০ (নিফটি সূচক তৈরি হয় প্রথম ৫০টা কোম্পানি যাদের বাজার মূল্য ভারতীয় শেয়ার বাজারের দুই তৃতীয়াংশ।) ২০১৯ এর ফেব্রুয়ারিতে সেই আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪০৪-এ, অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২% মাত্র। এই কোম্পানি গুলো দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং করপোরেট মুনাফা ঐতিহাসিক ভাবেই জিডিপির থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কোনো এক ত্রৈমাসিক কালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে কিন্তু একাদিক্রমে চার বছর ধরে এই স্খলন কোনো অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার অতীত।

চিত্র ৫: মোট পুঁজি গঠন (জিডিপির শতাংশ হিসাবে)

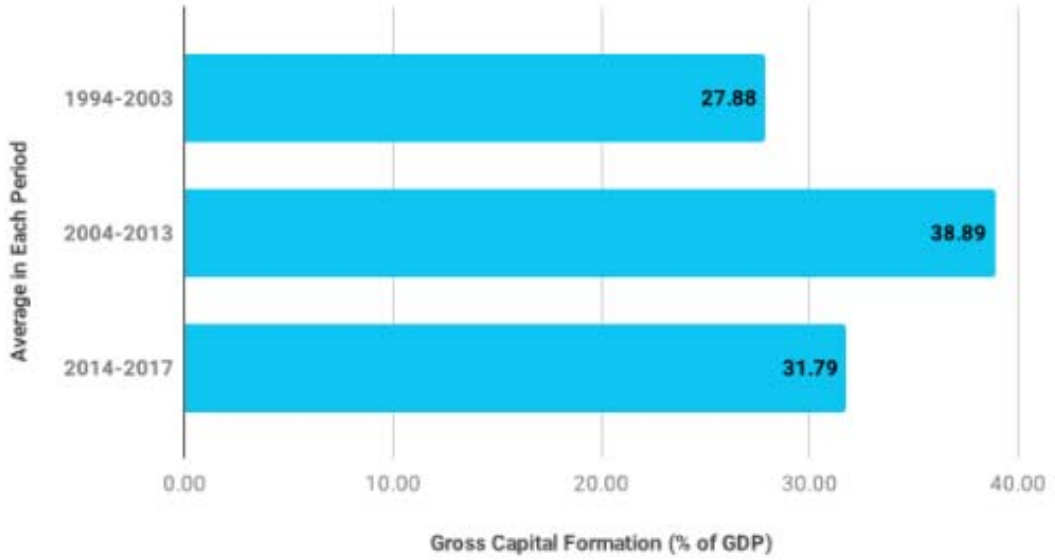

শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ কোম্পানির প্রচুর পরিমাণে অব্যবহৃত পুঁজি থেকে গেছে। তাই নতুন বিনিয়োগে তারা উৎসাহী নয়। মোদীর শাসনকালে পুঁজি গঠন গড়া জিডিপির ৩১.৮% এ নেমে এসেছে। ইউপিএ র আমলে তার আগের গোটা দশকে এই গড় ছিল ৩৯%, আর তার আগের দশকে ছিল ২৮% (চিত্র ৫)। সিএমআই ই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই ত্রৈমাসিক কালে নতুন প্রজেক্ট ঘোষণার সংখ্যা গত চোদ্দ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর অর্থ বেসরকারি বিনিয়োগের নিম্নগামী ধারা অব্যাহত রয়েছে। খুচরো ব্যবসা এবং বেসরকারি বিমান চালনার ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির বিধি সরল করার পরেও এফ ডি আই জাতীয় আয়ের মাত্র ১.৫% (২০১৩ সালেও শতাংশ হিসেবে একই ছিল, যদিও ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে যৎসামান্য উন্নতি হয়েছিল।) অতএব দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিদেশি বিনিয়োগের ওপর খুব একটা নির্ভর করা যাচ্ছে না।

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার আরেকটা উৎস হতে পারে রপ্তানি। কিন্তু মোদী জমানায় সেক্ষেত্রেও কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

গত চারবছরে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার প্রবণতা ভীষণ ভাবে কমে যাওয়ায় টাকার যোগানের অভাবে অর্থনীতি ধুঁকছে। যেখানে ২০১৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৫%, সেখানে নোটবন্দির পর ২০১৬-র চতুর্থ ত্রৈমাসিকে এসে বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৪%। এরপর ধীরে ধীরে ২০১৮-র তৃতীয় ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৭%, যা ২০১২-১৪'র তথাকথিত নীতিপঙ্গুতার আমলের গড় বৃদ্ধির অর্ধেকমাত্র।

চিত্র ৬: ভারতীয় রপ্তানির গড় বৃদ্ধির হার (শতাংশে)

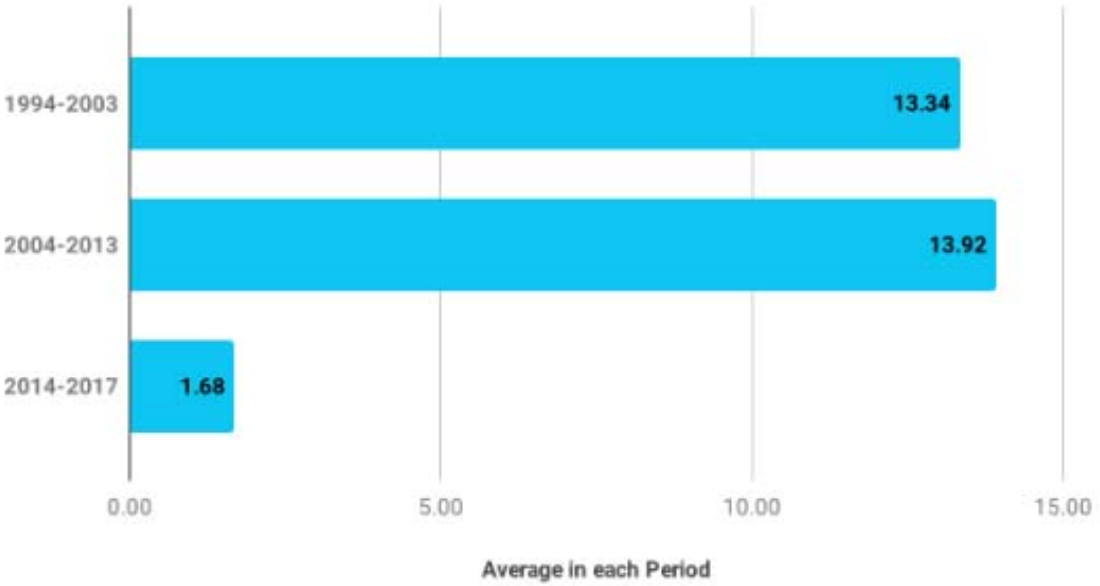

শিল্পক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না, ঋণের যোগান সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে, শ্রমের বাজারে বিপুল বেকারত্ব, এমনকি রপ্তানির হার পর্যন্ত তলানিতে এসে ঠেকেছে। সবমিলিয়ে মোদী জমানায় অর্থনীতির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ২০১৪-১৭ সালে গড়ে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৬৮% হারে, যেখানে আগের দুই দশকে সেই হার ছিল ১৩-১৪% (চিত্র ৬, দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় মোদী ২০২০ সালের মধ্যে মোট রপ্তানির জন্য ৯০০ বিলিয়ন ডলারের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন, তা নিতান্তই অবাস্তব। চলতি খাতে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে জিডিপির ২.৯%, যার অন্যতম কারণ ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম পড়ে যাওয়া। অথচ, একই সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশ বা ভিয়েতনামের মত প্রতিবেশী দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। শ্রম-নির্ভর রপ্তানি শিল্পের উপরে জোর দেওয়ার ফলে এই দেশগুলো কর্মসংস্থানের সমস্যা অনেকটাই সমাধান করতে পেরেছে। অন্যদিকে ভারতীয় অর্থনীতি দ্বিমুখী চাপে হাঁসফাঁস করছে। একদিকে নোটবন্দীর ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতিজনিত ক্রমহ্রাসমান বিনিয়োগের হার, অন্যদিকে রপ্তানি বাড়ানোয় সম্পূর্ণ ব্যার্থতা। এর ফলে মোদীর চটকদারি বিজ্ঞাপনী স্লোগান 'মেক ইন ইণ্ডিয়া' কার্যত 'মেস ইন ইণ্ডিয়া' বা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়েছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের অসুখ আরো গভীরে। মাঝারি এবং ছোট শিল্প এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে নোটবন্দির ফলে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, আজ আড়াই বছর পরেও তার নিরাময় হয়নি। তড়িঘড়ি করে চালু করা জিএসটি সেই ক্ষতকে গভীরতর করেছে।

কর্মসংস্থানের এই ভয়াবহ দুরবস্থার সঙ্গে যোগ হয়েছে শিক্ষার ব্যাপক গৈরিকিকরণ।একদিকে শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ ক্রমাগত কমছে, অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি হস্তক্ষেপ। 'সবই ব্যাদে আছে' এই হল কারিগরি ও বিজ্ঞান বিষয়ে শাসকদলের মতবাদ।

সব মিলিয়ে অর্থনীতির ছবিটা অত্যন্ত হতাশাজনক। কৃষিপণ্যের দাম না পাওয়ায় এবং আয় অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে চাষীরা বিপর্যস্ত, নোটবন্দি এবং জিএসটির জোড়া ধাক্কায় গ্রাম এবং মফস্বলে কাজ নেই, কর্পোরেট দুনিয়া,কম মুনাফা, অব্যবহৃত পুঁজির আবর্তে আটকে হাঁসফাঁস করছে। ফলে কোনো ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান হচ্ছে না।

২০১১-১২ র পর থেকে দারিদ্র্যের কোনো সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়নি। একদিকে ৯০% ভারতবাসীর দিন গুজরান করতে নাভিশ্বাস উঠছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর সম্পদ ক্রমশ আকাশ ছুঁচ্ছে।

টমাস পিকেটি এবং তাঁর সহকর্মীরা আর্থিক অসাম্যের ওপর যে তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ৫০% মানুষের অধিকারে মোট সম্পদের মাত্র ৬.৪% রয়েছে, আর ধনীতম ১% এর কাছে মোট সম্পদের ৩০% রয়েছে। একইভাবে দরিদ্রতম ৫০% মানুষ জাতীয় আয়ের মাত্র ১৪.৬% অর্জন করেন, যেখানে ধনীতম ১% পান মোট জাতীয় আয়ের ২১%। আরো চিন্তার বিষয় হলো এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান। 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' এর স্লোগান তাই যেন দেশবাসীর প্রতি মোদীর এক নিষ্ঠুর ঠাট্টা।

উপসংহার

৩১ শে জানুয়ারি সিএসওর দেওয়া সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে জিডিপির বৃদ্ধির হার ছিল ৭.২%। আর ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ২০১৮-১৯ এর আনুমানিক হার ছিল ৭%। ২০১৮-১৯ এর বৃদ্ধির হার মোদী সরকারের পাঁচ বছরের শাসনকালের মধ্যে সর্বনিম্ন। মনে রাখা ভালো, এটা হলো সিএসওর সংশোধিত পরিসংখ্যান, যা অনুযায়ী নোটবন্দীর পরে আয়বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে ৮.২%।

অর্থাৎ আকাশের চাঁদ হাতে এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট জেতার সাড়ে চার বছর পর আমরা দাঁড়িয়ে আছি এমন এক সন্ধিক্ষণে যখন কর্মসংস্থানের হার বিগত চার দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন, কৃষিক্ষেত্র বিপর্যস্ত, অসংগঠিত ক্ষেত্র রক্তশুন্য, টাকার মূল্য তলানিতে, চলতি খাতে ঘাটতি ক্রমবর্ধমান, সুদের হার চড়া ব্যাংকিং ক্ষেত্র অপরিশোধিত ঋণের ভারে ন্যুব্জ, কর ব্যবস্থা বেহাল, কর্পোরেট মুনাফার হার নিম্নমুখী, রপ্তানি ক্রমশ কমছে, এবং জিডিপি বৃদ্ধির হার যাবতীয় সংখ্যাতাত্ত্বিক চাতুরির পরেও আগের দশকের তুলনায় কম। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া প্রত্যাশার বুদবুদ আজ ফেটে গেছে। পড়ে আছে শুধু ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন আর আশাভঙ্গের তিক্ততা। মার্কিন রাজনীতিবিদ মারিও কুমো একবার বলেছিলেন, "নির্বাচনী প্রচার হল কবিতা, কিন্তু দেশ শাসন হল কঠোর গদ্য।" প্রতিশ্রুতি দেওয়া সহজ, কিন্তু পূরণ করা শক্ত। শেয়ার বাজারের মতোই রাজনীতিতে প্রত্যাশার বুদবুদ তৈরি হয়। কিন্তু দিনের শেষে কাজের হিসাব দিতেই হয়। মোদীরও এখন সেই হিসেব চোকানোর পালা। এবং সমস্ত হিসেবনিকেশ শেষ হলে একজন রাজনীতিকের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা পড়ে থাকে তাও শেষ বিচারে একটি সংখ্যাই – লোকসভায় আসনসংখ্যা । ২০১৪ সালে মোদীর সেই ম্যাজিক সংখ্যা ছিল ২৮২। এবারে কি হবে তা অনতিদূর ভবিষ্যতেই জানা যাবে, যদিও তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থকও মনে করছেননা আসনসংখ্যা বাড়বে। বরং নির্বাচনী প্রচারের উগ্রতায় একধরণের অনিশ্চয়তার ভাবই প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিভাগ : আলোচনা | ২৮ এপ্রিল ২০১৯ | ৪৮৬* বার পঠিত

পছন্দ জমিয়ে রাখুন গ্রাহক পুনঃপ্রচার